প্রথম পার্থ - বুদ্ধদেব বসু (সামগ্রিক আলোচনা) ।

বাংলা সাহিত্যে বহুমাত্রিক প্রতিভার ধারায় এক দীপ্র নাম বুদ্ধদেব বসু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর কালে সংক্ষুব্ধ বিশ্ব-পরিবেশে বাংলা সাহিত্যে তাঁর দীপ্র আবির্ভাব। দীর্ঘ ষাট বছরের নিরন্তর সাহিত্য-জীবনে বুদ্ধদেব রেখে গেছেন উজ্জ্বল কিছু শিল্পকর্ম। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর মতো সব্যসাচী প্রতিভা আর কেউ আসেন নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন জ্যোতির্ময় এক প্রতিষ্ঠান। কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও ঔপন্যাসিক ছোটগাল্পিক নাট্যকার প্রবন্ধকার সমালোচক অনুবাদক- এসব পরিচয়েও তিনি বিশিষ্ট। এ ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যনাটকের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলা কাব্যনাটকের ধারায় বুদ্ধদেব সঞ্চার করেছেন এক স্বকীয় মাত্রা। মিথ-পুরাণ আশ্রিত তাঁর কাব্যনাটকগুলো বিষয়গৌরব ও প্রকরণবৈশিষ্ট্যে বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
মিথের সমকালস্পর্শী ব্যঞ্জনায়, পুরাণের নবতর ভাষ্য নির্মাণে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকগুলো অনন্য অনুপম অদ্বিতীয়। কাব্যনাটকে নাটকীয় সংঘাতের পাশাপাশি কবিতার যে ব্যঞ্জনা উপস্থিত থাকে, বুদ্ধদেবের রচনা থেকে পাঠক তার স্বাদ কানায় কানায় উপলব্ধি করতে পারবেন। নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি এবং সমাপ্তির ব্যঞ্জনা নির্মাণে বুদ্ধদেব অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এ ধারায় তাঁর যেসব কাব্যনাটকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তার মধ্যে আছে- তপস্বী ও তরঙ্গিণী, কালসন্ধ্যা, অনাম্নী অঙ্গনা, প্রথম পার্থ, সংক্রান্তি, প্রায়শ্চিত্ত, ইক্ষাকু সেন্নিন, অনুরাধা প্রভৃতি।
বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক বিষয়গৌরবে যেমন অনন্য, প্রকরণ-প্রকৌশলেও তেমনি বিশিষ্ট। তাঁর কাব্যনাটকের সংগঠন স্বয়ংস্বতন্ত্র, অনুপম, অদ্বিতীয়। প্রধানত মহাভারত-এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুকাহিনী অবলম্বনে তিনি যে-সব কাব্যনাটক লিখেছেন, তাতে ফুটে উঠেছে তাঁর প্রাতিস্বিক কল্পনাশক্তির পরিচয়। সংলাপ নির্মাণে তিনি রেখেছেন অসামান্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর। নাটককে হতে হয় মঞ্চোপযোগী। এ ক্ষেত্রেও বুদ্ধদেবের কাব্যনাটকগুলো সার্থকতায় উত্তীর্ণ। বস্তুত, বুদ্ধদেবের হাতেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলা কাব্যনাটকের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়।

ভূমিকা:-
মানবিক সৌন্দর্যে চিরকালীন এক দৃশ্যকাব্য বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম পার্থ'। ভাতৃত্বের জয়গান নিয়ে মহাকাব্য রামায়ণ আর বিরোধের সংকট নিয়ে মহাকাব্য মহাভারতের কথা আমরা সকলেই জানি। মহাকবি বাল্মিকীর রামায়ণের চরিত্র আর ঘটনার ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে মেঘনাদবধ কাব্য লিখে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অনেকটা ঠিক সেভাবেই মহাভারতের চরিত্র এবং ঘটনার ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে 'প্রথম পার্থ' কাব্যনাট্য লিখলেন সমালোচক- নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু।

মহাভারতের কর্ণ একটি ট্র্যাজিক চরিত্র। মহাবীর, দাতা, মহানুভব ইত্যাদি নানা অভিধায় চিত্রিত তাঁর চরিত্রের কাঠামো। পঞ্চপাণ্ডব মাতা কুন্তী কর্ণেরও মাতা। অথচ এই তথ্য সর্বসাধারণ্যে প্রকাশযোগ্য ছিল না। কেননা কর্ণের কোনও মানবীয় পিতা ছিলেন না। সূর্যরশ্মির শক্তিতে কুন্তীর গর্ভে আসেন কর্ণ। লোকলজ্জার ভয়ে কুন্তী তাঁকে ত্যাগ করেন নিভৃতে। সেই থেকে কর্ণ লালিত-পালিত হন অধিরথ ও রাধার আশ্রয়ে।

মহাভারতে বর্ণিত ঘটনানুসারে নানাবিধ কারণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। একদিকে কৌরবরা রাজ্যের সূচাগ্র দেবে না পাণ্ডবদের অন্যদিকে পাণ্ডবরাও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই দুই অংশের সমঝোতায় পৌঁছতে না পারার সুযোগে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই যুদ্ধ এতো দীর্ঘায়িত হয়তো হতো না কিংবা হয়তো যুদ্ধের প্রয়োজনই ফুরিয়ে যেত, একপক্ষ সন্ধিতেও রাজি হয়ে যেত যদি না একজন ব্যক্তি এই যুদ্ধে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকতেন।

তিনিই কর্ণ। মহাবীর, মহাবঞ্চিত কর্ণ।

কুরুক্ষেত্রের সেই মহাযুদ্ধের ঠিক আগের দিন দুপুর থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সময়বৃত্তে বাঁধা বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য 'প্রথম পার্থ'। অনিবার্য যুদ্ধকে ঠেকাতে কর্ণের কাছে মাতা কুন্তী, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের আগমণকে কেন্দ্র করে এই নাট্যের উপরিকাঠামো নির্মিত। স্থান-কাল-পাত্রের বিন্যাসও সংহত। গদ্যছন্দে রচিত এই কাব্যনাট্যে আমরা দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পাই। তাঁদের অধিষ্ঠান কখনো যাত্রার বিবেকের মতো আবার কখনো ব্রেখটের এলিয়েনেশন তত্ত্বের আলোকে সচল কোনো চরিত্রের মতো। তাঁদের কথোপকথন দর্শকল বা পাঠককে চরিত্রের সংলাপের ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকতে দেয় না। নতুন কোনও সম্ভাবনা অথবা ভাবনার দিকে ঠেলে দেয়।

এই কাব্যনাট্যের শুরুতে আমরা দেখতে পাই দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কথাচ্ছলে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন নাট্যের গতি-প্রকৃতি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কেন সংঘটিত হচ্ছে আর কী তার পরিণাম এসবই আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হচ্ছে তাঁদের কথোপকথনে। তাঁরাই জানিয়ে দিচ্ছেন এ নাট্য কর্ণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে। ফলে পাঠক কিংবা দর্শক সূচনালগ্নেই এক ধরনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। কর্ণের জন্ম নিয়ে নানা সংশয় তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। কিন্তু এরই ফাঁকে প্রথম বৃদ্ধের মুখ দিয়ে রচয়িতা কয়েকটি শব্দে বলিয়ে নেন ভীষণ আধুনিক এক দর্শনের সারার্থ।

'যাকে বলে প্রতিভা, তা সহজাত।'

অনতিকাল পর আসেন পঞ্চপাণ্ডব মাতা কুন্তী। আসেন কর্ণের সঙ্গে কথা বলতে। সব সন্তানের প্রতিই জন্মদাত্রীর ভালোবাসা থাকে। কিন্তু কারো কারো প্রতি প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত এড়িয়ে যেতে পারেন না কোনো মা-ই। মহাভারতে আমরা দেখি, অর্জুনের প্রতি মাতা কুন্তীর প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত বরাবরই ছিল। এই নাট্যেও তার আড়াল থাকেনি। কখনোই স্বীকৃতি না দিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগের দিন কুন্তী এসে দাঁড়ালেন কর্ণের সামনে, মাতৃত্বের অধিকার নিয়ে। বললেন,

এই আমি:

যার গর্ভ ছিলো তোমার প্রথম মর্ত্যলোক,

যার ভুক্ত অন্ন প্রথম পথ্য ছিলো তোমার,

যার প্রাণবায়ুতে তুমি প্রথম নিশ্বাস নিয়েছিলে-

শোনো আজ তার মুখ থেকে, বিদ্ধ ক'রে নাও হৃদয়ে:

তুমি কুন্তীপুত্র, তুমি সূর্যের সন্তান।

দ্বিধান্বিত সংশয়াচ্ছন্ন কর্ণ বিস্তারিত দর্শনে বুঝতে চাইলেন এই দাবির মর্মার্থ। ভাববাদিতা আর বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে কর্ণ উত্তর দেন,

‘কে নয় সূর্যের সন্তান এই জগতে? যা-কিছু আছে সপ্রাণ,

তৃণ, বৃক্ষ, জন্তু, মানুষ-যারা পরস্পরকে আহার ক’রে

বংশপরম্পর বেঁচে থাকে, জন্ম-জন্মান্তরে ঘূর্ণিত হয়-

সূর্য তাদের সকলেরই পিতা, সকলেরই প্রতিপালক।

পশুর মলজাত যে-কীট, সেও তো সূর্যের সন্তান।’

কিন্তু পরক্ষণেই যখন বুঝতে পারেন, এটা কোনো ভাবার্থমূলক বয়ান নয়, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই জন্মদাত্রী। তখন কর্ণের আধুনিকতার সীমানা পেরিয়ে যাওয়া উক্তি,

‘আমার মনে হয় মাতা একাই সন্তানের জন্ম দেন,

আমার মনে হয় আমরা সকলেই কুমারীর সন্তান-

পিতা শুধু উপলক্ষ- গোত্রচিহ্ন।’

মহাভারতে কুন্তী যে কারণে কর্ণের কাছে আসেন তা হচ্ছে, পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণ রক্ষা। বসুর নাট্যে পাণ্ডবদের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে না এসে কুন্তী এসেছেন চিরকালীন মাতৃত্বের অবয়ব নিয়ে। তবে পাণ্ডবদের স্বার্থরক্ষার আকাঙ্ক্ষা একেবারেই উহ্য থেকেছে এমন নয়। প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত লক্ষ্য করা গেছে। যদিও কর্ণকে তাঁর আত্মপরিচয়ের সংকট কাটিয়ে রাজ্যের অংশীদারিত্ব ও পাণ্ডবর্গের অন্তর্ভুক্তির মর্যাদা সেই সাথে দ্রৌপদীর স্বামিত্ব লাভের প্রলোভন এ সবই প্রস্তাবিত হয়েছিল কুন্তীর পক্ষ থেকে, কিন্তু সেই প্রস্তাব কর্ণের মঙ্গলনিমিত্ত নয়, উদ্দেশ্য পাণ্ডবদের রক্ষা। ফলে এতোকাল পর আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের সুযোগ হাতের কাছে এলেও তাকে সম্মান জানাতে পারেননি কর্ণ। তাই তাঁর ছোঁড়া সংলাপে বঞ্চনার ক্ষত স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। কর্ণ বলেন,

‘তাহ'লে...এই আপনার অভীষ্ট? পাণ্ডবের শ্রীবৃদ্ধি?

অর্জুনের আয়ু?

সেইজন্যই এই পরিত্যক্ত পুত্রকে আজ

মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করলেন?’

মাতা কুন্তী তবু দমে যাননি। সন্তানের প্রতি মায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে ওঠেন তিনি। এমন কী কাহিনির অংশ হয়ে ওঠা দুই ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের একজন যখন দেবতাদের অভিপ্রায় কুন্তীর আকাঙ্ক্ষার

অনুরূপ এই বলে মতামত ব্যক্ত করেন, যখন তারা বলেন, যেহেতু পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীর সন্তান আর কর্ণ নিজেও তাই। ফলে পঞ্চপাণ্ডব আর কর্ণ পরস্পরের ভাই। এই যুক্তি শোনার পর কর্ণ আরও প্রাগ্রসর চিন্তার স্ফূরণ ঘটান তাঁর বক্তব্যে, যা সর্বজনীন হয়ে দাঁড়িয়ে যায় সহসাই।

‘আমি শাস্ত্র মানি না : আমার ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব।

যদি পাণ্ডবেরা আমার ভ্রাতা হন, তবে কৌরবেরাও তা-ই।

যদি মনু হন আদিপিতা, আমার ভাই তবে সর্বমানব।’

মহাবীর কর্ণের চরিত্রের সবচেয়ে বলিষ্ঠ দিক, আত্মসংকল্পে অটল অবিচল। শত প্রলোভনেও যা হতে বিচ্যুত হন না এমনই কঠোর। ফলে তাঁর চরিত্রের আভিজাত্য স্বতন্ত্র হয়ে প্রকাশিত হয়। কারো সঙ্গে মেলে না প্রায়। নিজের যোগ্যতায় অর্জন করতে চান যা কিছু, দান কিংবা পরম্পরাগত হয়ে কোনো কিছুর অধিকার দাবি করেন না, তা সে হোক শাস্ত্র সিদ্ধ অথবা ধর্ম সমর্থিত। কর্ণ স্বয়ংবরসভায় লক্ষ্যভেদের মাধ্যমে অর্জন করতে চেয়েছিলেন দ্রৌপদীকে। কিন্তু সূতপুত্র অপবাদে তাকে বঞ্চিত করা হয়। যখন মাতা কুন্তী সেই পরমারাধ্য দ্রৌপদীকেও ভ্রাতাসূত্রে কর্ণেরও পত্নী বলে ঘোষণা দেন, যখন বলেন এটা ধর্মসিদ্ধ তখন কর্ণের চরিত্রের বলিষ্ঠতার অনন্য দিক উন্মোচিত হয়। তিনি বলেন,

‘ধর্মত’! ‘ধর্মত’! আর শুনতে চাই না ‘ধর্মত’।

আমি চেয়েছিলাম জয় করতে দ্রৌপদীকে- নিজের জন্য-

একান্তভাবে-

কিন্তু পারিনি- আমার শক্তির অভাবে নয়, আপনার ধর্ম

সুপ্ত ছিলো ব’লে।

আর আজ আমাকে ষষ্ঠাংশে তার পতি হ’তে বলছেন?

-না!

আমার কাম্য নয় কোনো নারী- কোনো রাজত্ব-

যা বিনা চেষ্টায় জন্মসূত্রে প্রাপণীয়,

আমার গ্রাহ্য নয় অনর্জিত কোনো উত্তরাধিকার।

এ নাট্যে প্রক্ষিপ্ত সংলাপে শুধুমাত্র ব্যক্তির বিভিন্ন দিকই উন্মোচিত হয় নি, চিরকালীন কথকতার সমাবেশও ঘটেছে নানা অংশে। তবে তা আরোপিত পন্থায় নয়, স্বতঃস্ফূর্ত বিন্যাসে। কুন্তীর কথায় এ ধরনেরই একটি দর্শনের আভাস জেগে ওঠে। তিনি বলেন,

‘যুদ্ধ ভালো নয়, যুদ্ধ ভালো : দুটোই সমান সত্য,

স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে।

অহিংসা উত্তম ধর্ম, যদি সকলেই তা মেনে চলে- নচেৎ নয়।’

এই অংশের কিছুদূর পর আবার কর্ণের কাছ থেকে শুনি আরও এক সর্বজনীন কথা। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকে রঘুপতি এ জগতকে মহাহত্যাশালা হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর কর্ণ এ পৃথিবীর সব কর্মের প্রচেষ্টাকে যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন। দুটোই প্রকৃতির বিধান। অলংঘণীয়। কর্ণ বলেন,

‘যাকে বলে উদ্যম, চেষ্টা, পৌরুষ - যুদ্ধ তারই নামান্তর,

যুদ্ধহীন কোনো কর্ম নেই জগতে।’

বুদ্ধদেব বসুর এ কাব্যনাট্যের একটি প্রধান দিক হচ্ছে, উপস্থাপিত ছয়টি চরিত্রই শেষ পর্যন্ত ইতিবাচকতায় ধাবিত আধুনিক। অদৃষ্টবাদী পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যদিয়েই তিনি বলিয়ে নিচ্ছেন অদৃষ্টবাদবিরোধী মুক্তমানবের বয়ান। কর্ণকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাতে এলে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সংশয় প্রকাশ করলে দ্রৌপদী ঘোষণা দেন,

‘কিন্তু আমি অদৃষ্টবাদী নই। আমি আস্থা রাখি চেষ্টায়।’

মানুষ যখন মানুষ তখন সে ভালো-মন্দ নিয়েই। মানুষ হিসাবে মানুষের সীমাবদ্ধতা অনেক। ফলে নানা দোষ-ত্রুটি তাকে ঘিরে থাকবেই। তবে কী আমরা আদর্শ মানুষ খুঁজে পাবো না। আমাদের এই জগতে কাউকে দাঁড় করিয়ে বলতে পারবো না, এই হচ্ছে আদর্শ মানুষ। প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে বিশুদ্ধ ভালো কিংবা আদর্শ মানবের কোনও অস্তিত্ব নেই জগতে। তুলনামূলক ইতিবাচকতার অধিকারীকেই আমাদের স্বাগত জানাতে হয়। যেমন, প্রথম বৃদ্ধ বলেন,

‘আমরা তাঁকেই শ্রদ্ধেয় বলি, যাঁর স্খলন স্বল্প, সদ্‌গুণ প্রচুর।’

নির্বাচন এলেই আমরা দেখতে পাই দলীয় মনোনয়নের বিপরীতে একদল বিদ্রোহী প্রার্থী দাঁড়িয়ে গেছেন। ভোটাভুটির কালে রাজনৈতিক দল এমনিতেই একটু কোণঠাসা থাকে। তার ভাবমূর্তি, নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার কৌশল, কাকে ছেড়ে কাকে দেবে মনোনয়ন, প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা ইত্যাদি নানা বিষয় তাকে বিবেচনা করতে হয়। অর্থাৎ দল তখন এক অর্থে বেকায়দায় থাকে। ঠিক তার সুযোগ নিয়ে, নিজদলীয় প্রার্থীকে হারাতে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে যান নির্বাচনে। এ অনেকটা নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গের মতো বিষয়। আমাদের সামনে রয়েছে আরেক পুরাণ রাবণের ভাই বিভীষণের

বিদ্রোহ, রবীন্দ্রনাথের বিসর্জনেও পাই রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ভাই বিদ্রোহ করেছেন আর রাজা ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ এড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বিদ্রোহ চিরকালীন। কিন্তু এইসব বিদ্রোহের বিপরীতে কর্ণ উদাহরণ হয়েই থেকে গেছেন। কোনও প্রলোভন, পরাজয়ের আগামবার্তা জেনে যাওয়ার পরও তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি অটল। দ্বিতীয় বৃদ্ধের কথায় এ ধরনের একটি চিত্রই উঠে আসে।

‘যারা সংকটকালে বিদ্রোহ করে, তারা কি ভালো?

হয়তো রাবণভ্রাতা বিভীষণের উত্তরে

ইতিহাসে কর্ণ থাকবেন দৃষ্টান্ত।’

পাছে লোকে কিছু বলে, এই সংকোচে আমরা অনেক সময় অনেক ইতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকেও পিছিয়ে আসি। ক্ষুদ্রার্থে কিংবা বৃহদার্থে যাই হোক না কেন, উদ্দেশ্য যদি হয় ভালো তবে আমাদের সংকোচ, লোকলজ্জা এইসব তো পাশেই ঠেলে দেয়া উচিত। দ্বিতীয় বৃদ্ধ বলেন,

‘যদি আপনার অভীষ্ট এই রাষ্ট্রের কল্যাণ,

যদি দ্বন্দ্বের সমাধান আপনার উদ্দেশ্য,

তা’হলে জানবেন লোকাচার তুচ্ছ, সংকোচ অনর্থক।’

বর্তমান সমস্যাসঙ্কুল যন্ত্রসভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশের যুগে মানুষ মূলত একা। কীভাবে! মানুষ চিরকাল স্বাধীন হতে চেয়েছে গোষ্ঠীর স্বার্থে, বৃহতের প্রয়োজনে। কখনো পেয়েছে, কখনো পায়নি। প্রকৃত স্বাধীন মানুষের পাশে কেউ থাকে না, থাকা সম্ভব নয়। বন্ধনযুক্ত কোনও স্বাধীনতা নাই। বন্ধনহীনতার মধ্যেই প্রকৃত স্বাধীনতা। নিয়ত অগণিত বন্ধনের চাপে মানুষ হারিয়ে ফেলে তার স্বাভাবিকতা, প্রত্যেক মানুষের মন যুগিয়ে চলতে গিয়ে মানুষ জটিল হয়ে ওঠে, হাঁপিয়ে যায়। ফলে ব্যক্তির জীবনে স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না, সে হয়ে ওঠে সবার মন যোগানোর উপচার মাত্র। অস্তিত্বকে যে প্রকৃতঅর্থে উপলব্ধি করতে পেরেছে সেই তার নিজস্ব জগতে একা এবং একামাত্র হয়ে গেছে। কর্ণের প্রাগ্রসর চিন্তাশানিত সংলাপ,

‘ আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ।’

আত্মপরিচয়ের যে সংকট কর্ণকে তাড়িয়ে ফিরেছে সব সময়, যে পরিচয়হীনতার কারণে বরাবরই উহ্য থেকেছে তাঁর অর্জন, পরজায় হবে জেনেও কর্ণ যথাযোগ্য সংশপ্তকের মতোই দৃপ্ত উচ্চারণে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করেন।

‘এই যুদ্ধ

আমার বহুকালের প্রতীক্ষিত, প্রত্যাশিত।

সে অর্থ দেবে আমাকে, আমার অস্তিত্বকে।

আর বিনিময়ে

নেবে আমার চরম চেষ্টা, অন্তিম উদ্যম,

আমার সব অব্যবহৃত আবেগ।

আমি স্বাগত জানাই

রক্তবর্ণ, ক্ষমাহীন, মুক্তিদাতা এই দেবতাকে।'

পুরাণের প্রকৃত মর্যাদা হয়তো এখানেই যে, কখনোই তার পুরনো হয় না। চিরকাল নতুন নতুন রূপে, নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে নিজেকে নবায়ন করে হাজির হয় নিজে, নতুবা অন্যকারো করতলগত হয়ে। আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে খুব সহজেই তো উপলব্ধি করে ফেলি, কী আমাদের তাড়ায়, ভালোবাসা কিংবা প্রাপ্তি আমাদের কতটুকু জুড়ে থাকে! তারচেয়ে কী ঢের বেশি দখল করে থাকে না অপ্রাপ্তি অথবা বঞ্চনা অথবা অপমানের ক্ষতগুলো। ক্ষণে ক্ষণেই আমাদের তাড়িয়ে ফেরে না, নিজের ভেতরে চিরকাল চিনচিনে ব্যাথার ক্ষরণ ঝড়ে না। কর্ণ তার পৌরাণিক অবয়বে যেন আমাদের কথাই বলে ফেলেন, তাতে অস্পষ্ট থাকে না তাঁর ব্যক্তিজীবনেরও নানা ঘাত-প্রতিঘাত আর বঞ্চনার চিহ্ন।

'পরাজয় আমার চিরকালে সঙ্গী, আর পরাজয়ের স্বাদ তীব্র।

পাণ্ডবেরা বনবাসেও জয়ী : কুন্তী তাঁদের মাতা।

পাণ্ডবেরা নিঃস্ব হ'য়েও জয়ী : পাঞ্চালী তাঁদের সাম্রাজ্য।

কিন্তু জয়ীরা তাঁদের প্রাক্তন জয় ভুলে যান, বা লজ্জিত হন

তার তুচ্ছতা ভেবে, কালক্রমে। পরাজয় কেউ ভোলে না।'

যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হচ্ছে, মানবতার বিপর্যয়। যুদ্ধের সবচেয়ে ঘৃণিত দিক হচ্ছে মানুষ হত্যা। অথচ আমরা যদি মানুষের অগ্রযাত্রার ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে দেখবো তার বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে যুদ্ধ আর হত্যার কথকতা। আমাদের কাছে সেই সবচেয়ে বড় বীর যার ঝুলিতে রয়েছে সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্তিত মুণ্ডু! একই প্রজাতি থেকে যদি মানবের উৎপত্তি তবে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের মধ্যেই তো আত্মীয়তার সম্পর্ক। অথচ আমরা স্থূলস্বার্থ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যাই সংঘর্ষে, যুদ্ধে। বিপর্যস্ত করি আমাদের মানবতাকে। এ নাট্যে কৃষ্ণের মুখ থেকে নিঃসৃত হয় এমন এক চিরন্তন সংলাপ।

'সব যুদ্ধই অন্যায়।

সব হত্যাই ভ্রাতৃহত্যা।’

পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ হয়েছে, হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে নিশ্চিত। আমরা নিশ্চয়ই জানি, যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কেউ জয়ী হয় না। প্রত্যেকেই পরাজিত হয়। প্রতিপক্ষের কাছ থেকে হয়তো সাময়িক জয় অর্জিত হয়, কিন্তু নিজের কাছে কী ভীষণভাবে লজ্জিত আর পরাজিত হয় মানুষ। কেননা যুদ্ধে মানবতা লাঞ্ছিত হয়। কেননা যুদ্ধে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করে পরস্পরকে হত্যার নিমিত্তে। সেখানে প্রেম উধাও, ঘৃণা প্রবল, প্রতিপক্ষের রক্তে স্নান ভীষণ প্রার্থিত। ফলে সভ্য ও সভ্যতার দাবিদার হিসাবে আমাদের পরিচয় লুপ্ত হয়। মহাবল কর্ণ যখন জানতে পারলেন এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হবেন, তবে অর্জুনের হাতে নয়, অর্জুনরূপী কৃষ্ণের হাতেই তাঁর মৃত্যু হবে, তখন কর্ণ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। কেননা মৃত্যুই তাঁকে এনে দেবে তার পরিচয়, যার জন্যে এতোকাল প্রতীক্ষা। এই পরাজয়কে ধন্য মানেন কর্ণ। কিন্তু কৃষ্ণ সেখানে কিছুটা বিমর্ষ। তিনি বলেন,

‘এ-যুদ্ধে সকলেই পরাজিত হবে, কর্ণ-

জয়ী, বিজিত, হত, উদ্বৃত্ত- সকলেই।’

প্রতিটি যুদ্ধেই মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আর পরাজিত করে নিজেকেই। মূলত মহাভারতের কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসুর প্রাগ্রসর চিন্তা, যুদ্ধবিরোধী চেতনা এই নাট্যে প্রবলরূপে মূর্ত হয়েছে। তিনি আশ্রয় করেছেন মানুষের চিরকালীনতা আর আত্মসম্মানবোধকে। আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দিলে মানুষ থাকে না, খোলস থাকে। চিরকালীনতা তো মহত্বে, আত্মসম্মানে। স্থূল কিংবা নতজানু অথবা লোভী মানুষের পক্ষে চিরন্তনের পাখায় ভর দিয়ে কাল থেকে কালান্তরে মানুষের হৃদয়ে কী স্থান করে নেয়া সম্ভব? ইতিহাস বলে, সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব বসু ‘প্রথম পার্থ’ নাট্যে এই বিষয়ের প্রতিই তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চিরকালীন অবয়ব তুলে এনেছেন তাঁর অমিত সবল লেখনীর মাধ্যমে।